সুবীর নাগ চৌধুরীর প্রবন্ধ

চলচ্চিত্র সাম্রাজ্যের এক অলিখিত শাহেনশা

যে সময় বাংলা সিনেমা দেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল উদাসীন বাঙালি সম্প্রদায় সেই সময় তাদের মনের শূন্যতাকে মেপে ফের সিনেমার টানে হলমুখী করতে পেরেছিলেন এক অনিন্দ্যসুন্দর শিল্প-নির্দেশক ঋতুপর্ণ ঘোষ। উনিশে এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়ার পর ১৭ বছর ধরে যেভাবে একের পর এক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পেরেছিলেন তা সত্যিই ঈর্ষণীয়। বাংলা বিজ্ঞাপন জগৎ যাঁর স্পর্শে খুঁজে পেয়েছিল সঞ্জীবনী শক্তি, সেই বেপরোয়া প্রতিভাবান শিক্ষিত শিল্পসত্তা ৩০ মে বৃহস্পতিবার ভোর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঘুমের মধ্যে হারিয়ে গেলেন ইন্দ্রাণী পার্কের 'তাসের ঘরের' বর্ণময় পুরুষ চিত্রাঙ্গদা— 'আ ক্রাউনিং উইন'-এর পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ।

শারীরিক অসুস্থতা শুরু হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগেই, প্যানক্রিয়াটিসে ভুগছিলেন প্রায় বছর খানেক — সাথে দোসর ছিল শুগার ও হিমোগ্লোবিন। মুঠো মুঠো ওষুধের মধ্যেই বেঁচেছিল সৃষ্টির ক্রিয়াশীল স্থাপত্য।

যাঁর নির্মিত ছবি একদিন মসৃণভাবে গল্প বলে যেত সেই গল্পকারের নিজের জীবনের কাহিনিই আকস্মিকভাবে রুদ্ধ হয়ে গেল অমসৃণভাবে। সিনিয়ার-ফিল্ম-মেকিং-এর আদি অকৃত্রিম ধারাটির মধ্যে কে যেন অকস্মাৎ গতিপথ রুদ্ধ করে দিয়ে গেল। ছবিতে সহজভাবে গল্প বলার অবিসংবাদী ধারাটি যাঁর চলচ্চিত্রে এতদিন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল, তিনি রেখে গেলেন এমন এক দর্শন যা নিঃসন্দেহে চলচ্চিত্রামোদী আপামর মানুষকে বহুদিন পর্যন্ত স্মৃতির মণিকোঠায় তুলে রাখবে। সত্যজিৎ রায়-ঋত্বিক ঘটক-মৃণাল সেন্ এই ভুবনবিখ্যাত ত্রয়ী বাঙালি পরিচালকের নিও-রিয়ালিজমের স্বর্ণযুগ শেষে বাংলা ছবির জগতে এসেছিল এক শূন্যস্থান। সিংহাসনের শাহেনশার দখল নিতে চলচ্চিত্র প্রকৃতির বুকে উঠে এসেছিল প্রতিভাবান নব্য পরিচালকের একটা জোয়ার। সেই

নবতরঙ্গের অন্যতম সৃজনী প্রতিভা ছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। ছবি নির্মাণে এমন এক ধারার প্রতিষ্ঠা তিনি করলেন যা অটো-কর্মাশিয়াল-নির্ণায়ক সূচককে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাল। স্মৃতি-বেদনা-প্রেম-একাকিত্ব ইত্যাদি অতি চেনা মানসিক অনুভূতিগুলির মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র শিল্পের কোনো অচেনা অধরা সত্যের অন্বেষণে তিনি সবসময় চলচ্চিত্র চিন্তার সমুদ্রে ডুবে থাকতেন। ঋতুপর্ণ ঘোষ এমন একজন অভিনেতা যিনি সম্পূর্ণ একজন অভিনেতাকে বিশ্বাসযোগ্য অভিনেতায় বদলে নিতে পারতেন। ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবিগুলি বিষয়ী প্রধান। বিষয়ীর সত্তা ও রূপ নির্মাণে বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতেন। 'উনিশে এপ্রিল' থেকে 'চিত্রাঙ্গদা' প্রায় সব ছবিতেই চরিত্রগুলির মানসিক গঠন, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, তাঁদের অন্তর্জগৎ, তাঁদের কামনা বাসনা উন্মুক্ত হয়েছে ঋতুপর্ণের ছবিতে। ছবির প্রধান চরিত্রগুলির নিঃসঙ্গতা প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর ক্যামেরায়। বস্তুত এই ছিল ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘ গবেষণা ও ব্যক্তিগত অনুভব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর চলচ্চিত্রে। তাঁর সৃষ্ট চলচ্চিত্রে বিষয়ের অন্তর্জগৎ এ সারবত্তা প্রকাশ পেত নিটোল সংলাপ ও নাটকীয় কাহিনির মাধ্যমে। সংলাপ রচনা ও গল্প বলায় তাঁকে সত্যজিৎ রায় ও তপন সিংহের উত্তরসূরী বলা হয়।

'বাড়িওয়ালি' ছবিতে গল্পের কেন্দ্রে থাকে স্বর্ণলতা আর তার নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব। বাড়িওয়ালি গল্পে চলচ্চিত্রকার যেভাবে গল্পের ঠাসবুনোটে সমস্ত চিত্রনাট্যটাই সাজিয়েছেন তা এক অদ্ভুত বৈচিত্র্যে।

ঋতুপর্ণর প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'উনিশে এপ্রিল' (১৯৯৪)-এ সেলিব্রিটি মা ও তরুণী মেয়ের অন্তর্জগৎ। তাদের সম্পর্কের দূরত্ব ও নৈকট্য ঋতুপর্ণর ক্যামেরার অন্তর্দৃষ্টিতে গভীর পর্যবেক্ষণের এক রূঢ় বাস্তব চিত্র হয়ে ওঠে।

পরবর্তীকালে ১৯৯৭ এ মুক্তিপ্রাপ্ত হয় 'দহন'—অত্যন্ত কাহিনিকেন্দ্রিক ছবি। ২০০০ সালে নতুন উপলব্ধি নিয়ে 'উৎসব' আপামর বাঙালির হৃদয়ে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তারপর এল বাড়িওয়ালি (১৯৯৯), অসুখ (১৯৯৯) ও শুভ মহরৎ (২০০৩)।

মাত্র ২০টা বছর চলচ্চিত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন ঋতুপর্ণ। ১৯৯২-২০১৩ এই সময়টুকুর মধ্যেই বিশেষত শেষ পাঁচ ছয় বছর বারবার তাঁর চলচ্চিত্র ও লেখনী রবীন্দ্রময় হয়ে উঠেছিল। 'চোখের বালি'র চারবছর পরে প্রকাশিত হয় 'নৌকাডুবি'। সাতবছরের ব্যবধানে উপন্যাস দুটিকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্রে জোয়ার এনেছিল ঋতুপর্ণ ঘোষ।

চোখের বালি উপন্যাসে স্বামী-স্ত্রী, মা-ছেলে, বন্ধু-সই এই রকম নানা

প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বন্ধন ভেঙে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে আঘাত এসেছিল অন্যভাবে। নৌকাডুবি সিনেমায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই এক চরিত্র। হেমনলিনীর মুখে বারবার উচ্চারিত হয় তাঁর নাম। বিয়ের প্রসঙ্গে ঠাট্টা করে সে জানায় রবিঠাকুরই তার পাত্র। কুড়ি বছর তো অতিক্রান্ত তারপরেও রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি আমন্ত্রণ জানানো হল সিনেমার ক্যানভাসে। এ কোন্ রবীন্দ্রনাথ? বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাড়ির আইকন।

ঋতুপর্ণ রবীন্দ্রনাথের বিশালতার মাঝে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথে। যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা নিয়ে রেখেছেন নানা অনুভূতির অন্তর্ঘাত, আমূল সংস্কার করতে চেয়েছিলেন আমাদের অনেক অনুভূতিকে। যেমন 'ভয়'। যেমন নিকষ কালো অন্ধকার আর নানা দুঃসহকে সহ্য করার অনুভূতি। নানা নিষেধের বেড়াজাল পেরিয়ে যাওয়ার অনুভূতি। নিজের শরীরকে ওই দিগন্ত অবধি বাড়িয়ে নেওয়ার অনুভূতি। ঋতুপর্ণ সেই অনুভূতি, সেই শিহরণ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে দুহাত পেতে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এই অনুভূতি, এই শিক্ষা, এই মনোবল পাওয়া অসম্ভব।

ঋতুপর্ণের নারীরা সীমানা অতিক্রম করে না। সমস্যার নির্মাণ করে। এ তথ্যের সত্যতা বারেবারে প্রমাণিত হয় 'উনিশে এপ্রিল', 'উৎসব' বা 'তিতলি' ছবিতে। 'চোখের বালিতে' বিনোদিনীর ঋতুরক্ত তাঁকে আহ্লাদিত করে। দৃশ্যের সেই অনির্বচনীয় তৃপ্তি দর্শকের মধ্যে বিলিয়ে দিতে উৎসুক।

'চিত্রাঙ্গদা'তে একজন বর্ষীয়সী রূপসীর বর্ণনা আনন্দ উপভোগ করেন। 'দহন' ছবিটিতে যে নিষ্ঠুরতার চিত্র ফুটে ওঠে সেখানেও ঋতুপর্ণ ঘোষের এক অস্বাভাবিক উপস্থিতি ভীষণভাবে উপলব্ধি করা যায়। চলচ্চিত্রে তাঁর নতুন বুদ্ধিদীপ্ত, ক্রিয়াশীল, যুক্তিবাদী অনায়াসভঙ্গি দেখে দ্রুত মিডিয়ার প্রশংসা পেলেন।

সত্যজিৎ রায়কে 'অপরাজিত'র পরেও কতটা সংবেদনশীল সে পরীক্ষাও দিতে হয়েছে। ঋত্বিক ঘটক তো আমৃত্যু প্রত্যাখ্যাতই রয়ে গেলেন। শ্রদ্ধেয় মৃণাল সেন বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে কতটা হৃদয়গ্রাহ্য ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেবে।

আপাতনিষিদ্ধ একটি কার্যক্রমকেও কী করে মূলধারার সাথে সংযুক্ত করলেন, এখানেই ঋতুপর্ণ ঘোষের ম্যাজিক রহস্য। তিনি আসলে আখ্যান রচয়িতা, সুকথক, কিন্তু কোনো সময়ই তিনি সত্যজিৎ রায়-র মতো অনুসন্ধানী নন। সত্তর দশকের শহরের ছবিগুলিতে সত্যজিৎ রায় নিজেকে আমূল পাল্টে ফেলার উদ্যোগী হন। ঋতুপর্ণ ঘোষ সে ঝুঁকি নিতে চাননি।

২৪শে জুন ১৯৯১ টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশন চত্বরে স্বামীর সামনে এক তরুণী

গৃহবধূর শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটে। যার প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন একজন তরুণী সাংবাদিক। ১৯৯৭-এ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঋতুপর্ণ ঘোষ তৈরি করলেন 'দহন'। যেখানে নারীশক্তির নারীসত্তা এবং অহংকে কেন্দ্র করে পিতৃতন্ত্রের অন্দর বাহিরের রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচিত হল এই দহন ছবিতে। ঋতুপর্ণ-র অন্য ছবির মতই দহনও তীব্রভাবে নারীকেন্দ্রিক। 'বাড়িওয়ালি' ছবিতে এক অবিবাহিত নারীর একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির পরিসরকে ধ্বস্ত করে দেয়। বাইরের পৃথিবীর পুরুষ, ফিল্ম ডিরেকটর দীপংকর— যে কেবল সফলতার ভাষাই বোঝে, ব্যক্তিগত নারীর চাওয়া-পাওয়াকে কোনও মূল্যই দেয় না।

'দোসর' ছবিতেও স্ত্রী কাবেরী নিজেকে প্রতারিত; চূড়ান্ত অপমানিত মনে করে যখন সে জানতে পারে স্বামী কৌশিক দিনের পর দিন অফিস ট্যুরের নাম করে অধস্তন অফিস পার্টনার মিতাকে নিয়ে রিসর্টে গিয়ে থেকেছে। সম্পূর্ণ সাদা কালোয় তোলা এই ছবিতে যৌনতার আলো আঁধারিকে একমাত্রিকভাবে দেখান না ঋতুপর্ণ। তিনি প্রবেশ করেন সম্পর্কের গভীর জটিলতায় যেখানে অবচেতন মন ক্রমশই খুঁজে পায়, আবিষ্কার করে সম্পর্কের আরও অনেক অচেনা দিগন্ত। বিশেষতঃ দাম্পত্য নামক প্রতিষ্ঠানটি যে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোর সাথে জড়িত সেই পুরুষতন্ত্রের ভিতর স্বেচ্ছায়-অনিচ্ছায় যে একটি মেয়েও জড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয় 'দোসর' সে কথাই প্রমাণ করেছে। ঋতুপর্ণর সৃজন পরম্পরায় 'অন্তরমহল' এক বিস্ফোরণ। শেষ উনিশ শতকের পটভূমিতে এক রক্ষণশীল হিন্দু জমিদার পরিবারের অন্দরমহলের যৌনতাকে ফোকাসে বেয়ে তোলা এই ছবিতে পুরুষ যৌনতার আধিপত্য, ভায়োলেন্স ও বিচার চিহ্নিত।

একইভাবে 'চোখের বালি' ছবিতেও বিনোদিনী সেই প্রোটাগনিস্ট নারী চরিত্র, যে পুরুষের দ্বৈতসত্তা অনৈতিকতার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে তছনছ করে দেয় অন্তঃপুরের বানানো মিথ্যাচার।

২০১০ ডিসেম্বর 'আরেকটি প্রেমের গল্প' ছবির অভিরূপ এমনই একজন চিত্রপরিচালক যে জন্মগতভাবে পুরুষ যৌনাঙ্গের অধিকারী হলেও, জীবনচর্চা, যৌন পছন্দ কোনদিক থেকেই সে পুরুষ নয়। এমনকি অন্যেরা তাকে দেহে পুরুষ, মনের দিক থেকে নারী বলে ভাবলেও, সে নিজেকে এ সবের থেকে স্বতন্ত্র এক ভিন্ন বর্গের মনে করে।

'মেমোরিজ ইন মার্চ' (Memories in March) ছবিতে মৃত হোমোসেকসুয়াল ছেলেটির মা কিছুতেই মানতে পারেন না, তাঁর ছেলে সত্যিই 'গে' ছিল এবং অফিস বস অর্ণবের সাথে তার সমকামী সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল অর্থাৎ এই মেইনস্ট্রিম কনসাসনেসকে ধাক্কা দিয়েই এই ছবি প্রমাণ করতে চায়

হোমোনরম্যাটিভি।৮ সহজভাবে গ্রহণ করার সময় এসেছে। অর্ণবের সঙ্গে মৃত সিদ্ধার্থের মায়ের পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠার মধ্য দিয়েই চলে গিয়েছে জেন্ডার অ্যাওয়ারনেসের দিকে। সেই দিক দিয়ে 'চিত্রাঙ্গদা'কে এ পর্যন্ত ঋতুপর্ণর শ্রেষ্ঠ ছবি বললে অত্যুক্তি হবে না। কেবল সমযৌনতা নয়, হোমোনরম্যাটিভিটির ভিতরেও যে এতগুলো স্তর থাকতে পারে, তা এই ছবি না দেখলে অবিশ্বাস্য মনে হত। পরিচালক ঋতুপর্ণের কার্যকালকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক: 'হিরের আংটি' থেকে শুরু করে 'শুভ মহরৎ'— যে সময়ের প্রায় প্রতিটি ছবিই দর্শকের ভালোবাসা ও সমালোচকের প্রশংসা দুই-ই পেয়েছে। দুই 'চোখের বালি' থেকে 'সব চরিত্র কাল্পনিক' প্রায় তাঁর সব ছবিতেই বলিউডি তারকাদের ঘনঘটা। তিন: 'আবহমান' থেকে 'চিত্রাঙ্গদা' যেখানে পরিচালক-অভিনেতা ঋতুপর্ণের চেয়েও কখনও কখনও বেশি অদম্য হয়ে উঠেছেন 'ব্যক্তি ঋতুপর্ণ'। ১৯৯২ থেকে ২০০২ সাল এই সময়ে তাঁর পরিচালিত ছবিগুলি হল 'হিরের আংটি', '১৯শে এপ্রিল', 'দহন', 'বাড়িওয়ালি', 'অসুখ', 'উৎসব', 'তিতলি' ও 'শুভ মহরৎ'।

ঋতুপর্ণ ঘোষের মা ও বাবা দুজনেই ছিলেন আর্টিস্ট। তার ভাই ইন্দ্রনীলও পেশায় শিল্প নির্দেশক। সুতরাং তাঁর নিজের কাজের মধ্যে যে রুচিবোধের ছাপ থাকবে, তা তো বলা বাহুল্য মাত্র। তাই তাঁর ছবির চরিত্রগুলির পোশাক নির্বাচন থেকে শুরু করে মেক আপ, ছবির সেট, ছোটোখাটো প্রপার্টি নির্বাচন, সব চরিত্রগুলির সংলাপ সবেতেই অদ্ভুত এক বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। যাই হোক, বিষয়ভাবনার দিক থেকে এই পর্যায়ের প্রতিটি ছবিই ছিল অভিনব। তা সে 'দহন'-এ সামাজিক ইস্যু হোক, 'অসুখ'-এ স্টার মেয়ে আর তার ছা-পোষা বাবা মায়ের মধ্যে সম্পর্ক হোক, 'উৎসব' এ পুজোকে কেন্দ্র করে পুরানোকে ভুলে নতুনে পা দেওয়াই হোক কিংবা 'শুভ মহরৎ' এর রাঙাপিসিমার সহজ সরল গোয়েন্দাগিরি। এই ছবিগুলির সাথে জড়িত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাঁদের জীবনের অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স দিয়েছেন, ২০০৩ সালে মুক্তি পায় ঐশ্বর্য রাই অভিনীত এবং ঋতুপর্ণ পরিচালিত 'চোখের বালি'। আর এই ছবিটি দিয়েই শুরু পরিচালক জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়টির। ২০০৩ থেকে শুরু করে ২০০৮ — এই পাঁচ বছরে তিনি যতগুলি ছবি পরিচালনা করেছেন প্রায় সবগুলির কেন্দ্রীয় চরিত্রে দেখা গিয়াছে কোনও না কোনও বলিউড সুপারস্টারকে।

'রেনকোট'-এ ঐশ্বর্য-অজয় দেবগণ, 'অন্তরমহল'-এ জ্যাকি শ্রফ-সোহা আলি খান-অভিষেক বচ্চন, 'দ্য লস্ট লিয়র'-এ অমিতাভ বচ্চন-প্রীতি জিন্টা-অর্জুন রামপাল, 'সব চরিত্র কাল্পনিক'-এ বিপাশা বসু, 'খেলাঘর'-এ মনীষা কৈরালা।

১৯৯৭ সালে ঋতুপর্ণ ঘোষ 'আনন্দলোক' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। ঋতুপর্ণ তখন বাংলা সিনেমার উদীয়মান চলচ্চিত্রকার। এমন একজন চলচ্চিত্রকার নিজের কাজের জগতের বাইরে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত হতে রাজী হয়েছেন। এ চরম সত্যটার জন্য অভিনন্দিত হওয়া প্রয়োজন। 'আনন্দলোক পুরস্কার' এর সূচনা তাঁর সময়কালের একটি বড়ো ঘটনা এবং নিঃসন্দেহে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বি.এফ.জে. এ ছাড়া তখন বাংলায় আর কোনো চলচ্চিত্র পুরস্কার ছিল না। ফলে এই পুরস্কার যেমন আনন্দলোক পত্রিকাকে আরও জনপ্রিয় হতে সাহায্য করেছিল তেমনই বাংলা ইন্ড্রাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত মানুষদের প্রাপ্য সম্মান ও স্বীকৃতি দিতে পেরেছিল।

ঋতুপর্ণ ঘোষের শেষ ছবি 'সত্যান্বেষী' প্রসঙ্গে দেবজ্যোতি মিশ্রের অনুভূতি — 'ঋতুর ব্যোমকেশ সম্পূর্ণ আলাদা। প্রয়োগে এবং ভাবনায় পৃথক। শুধু তাই নয়, ব্যোমকেশে যে ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ওর ভাবনায় ছিল তার অভিঘাত সাঙ্ঘাতিক। একটা কথা বলি, ঋতুপর্ণ নিজে এই ব্যোমকেশের জন্য একটা গান লিখেছে। হিন্দুস্তানি মার্গ সংগীতে তাকে সাজিয়েছি।'

'সত্যান্বেষী' ছবির জন্য ঋতুপর্ণ ঘোষের লেখা অপ্রকাশিত গান

তারা দিম তারা দিম
বিজুরি ঘন ঘোরহ
ব্যাকুল হিয়া তুণ্ডে তোরহ
বদর ডম্বরে বনানী নির্ঝরে
অমানিশা ঘন ঘোর ঘোর
তারা দিম তেরে কেটে দিম
সতত চিত মোর।
পলক পলক নাহি জোড়।
যমুনা পুলিনে জ্যায়সা কালিয়ানি
নিশিশিশি দিল ঢালিয়া দেখ
যমুনা সলিলে মোরা কালিয়া
ছলছল চনচলিয়া
গগন নিঃঝুম নগরী নির্জন
বিজুরি হানে ঘন ঘোর ঘোর।

মহাভারত ও শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে ইস্কন এর হয়ে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের একটা ছবি নির্মাণ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের পরবর্তী পদক্ষেপ ও দেবজ্যোতি মিশ্রর অনুভূতি ''সত্যজিৎ রায়ের পরে ঋতুপর্ণ ঘোষই শ্রেষ্ঠ

সৃষ্টিশীল মানুষ। বাকি সবার কথা মাথায় রেখে বলছি, শুধুমাত্র একজন চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে ঋতুপর্ণকে মাপতে গেলে ভীষণ অপরাধ করা হবে। ঋতুপর্ণ এক অসাধারণ জিনিয়াস। এত ভালো গদ্য লিখত ও যে, যে কোনো সময়ে চাইলেই সাহিত্যিক হতে পারত। কিংবা হয়তো ও চাইলেই হতে পারত কোনও নামকরা কবি। আজ যাঁরা, ঋতুপর্ণকে ফ্যাশন ডিজাইনার কিংবা উচ্চমানের ইন্টিরিয়র ডেকরেটর বলে ভাবছেন তাঁরা আসলে কেউই ঋতুপর্ণকে পুরোটা চেনেন না ... রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমার অসম্পূর্ণ বৃত্ত ঋতু সম্পন্ন করেছে। ওই আমায় রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে বারবার যেভাবে ও নিজের মতো করে ভেঙেছে, গড়েছে তা আর কেউ পারে নি। এই সাহসও কারও ছিল ন। ওর মধ্যে প্রচলিত ধারাকে ভাঙার একটা 'ডোন্টকেয়ার' স্বভাব ছিল। সংগীত সম্বন্ধে জ্ঞান ঔদাস কিংবা বাস্তববোধ আমাকে মুগ্ধ করেছে। সলিল চৌধুরী কিংবা মানিকদার সঙ্গে কাজ করার পরেও বলছি, ঋতুপর্ণ জিনিয়াস।" ঋতুপর্ণের সেই পরিচিত চিরাচরিত বেশভূষায় সজ্জিত দেখে জনৈক সাংবাদিক আর্তনাদ করে উঠেছেন, "তুই তো শেষ ঋত্বিক ঘটক হয়ে গেলি রে! হয়তো পরবর্তীকালে আর কোনও বাঙালি চলচ্চিত্রকার নিজের নামের আদ্যাক্ষর 'ঋ' দিয়ে সাজাবেন না, দুজনেই অকাল-প্রয়াত। প্রথমজন পঞ্চাশ বছরের তিনমাস পরে, দ্বিতীয়জন তিনমাস আগে। কিন্তু কী আশ্চর্য তফাৎ! প্রথমজনের শবযাত্রায় সামান্য একটা লরি জোগাড় করার জন্য হিমসিম খেতে হয়েছিল আর দ্বিতীয়জন সুরভিত থাকলেন রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের আশীর্বচনে। ঋত্বিক সর্বস্ব দিয়ে চলচ্চিত্র ব্যবস্থাকে আক্রমণ করেছিলেন ইতিহাসকে চিহ্নিত করতে দ্বিধা করেন নি, ফলে তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিল করুণ তিক্ত-কণ্টকাকীর্ণ পথ, সম্পূর্ণ নিভৃতে একাকী। ঋতুপর্ণ অসামান্য গুণী। তাঁর প্রতিভা ও কীর্তির আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে বিশ্বভুবন। সুতরাং তাঁর অন্ত্যেষ্টির ব্যাপারে সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল রাজকীয়, বীরের সম্বর্ধনায় বেজে উঠেছিল তোপধ্বনি। ইন্দ্রাণী পার্কের বাড়িতে থাকার সময়েই মাঝে মাঝেই একটা দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে করুণতম সুরটা ভেসে বেড়াত।"

'এত বড় বাড়িটায় আমি যেন জলসাঘর — এখানে বিশ্বম্ভর রায়ের মত একা বসে আছি' — ৩০ মে, বৃহস্পতিবার ভোর রাতে আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হল — 'Rituparna is no more in the World, passes away in his sleep after massive heart attack. In a message the eminent Film Director Gautam Ghosh expressed "Rituparna Ghosh came into the World of Cinema like a storm, with two remarkable Film on the trot. He has disappeared in a Similar Fashion, like a sudden gust of wind. His brilliant story telling reflected

contemporary society like never before." In a condolence, eminent actress Mrs. Kiran Kher had expressed her grief in writing, "Shocking! The moment I had heard about rituda's sad demise in the morning, I tried calling up on his number, but it was switched off. I don't even know whom to give my condolences to, so many memories are rushing to my mind that I don't even know how to translate them towards. He was just a great director, but also a prolific writer."

পরিশেষে প্রবীণ চলচ্চিত্রাভিনেতা চপল ভাদুড়ীর ব্যক্তিগত অনুভূতি— "সমাজ যাঁদের চিনেও চিনতে চায় না, দেখেও দেখতে চায় না, বুঝেও বুঝতে চায় না, ঋতুপর্ণ ঘোষ তাঁদের অন্তস্তলের মানুষ। ঋতুপর্ণ ঘোষের আকস্মিক চলে যাওয়াটাই যে কতটা মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ছিল। সত্যি কথা বলতে কী ভাবতেও চাইছিও না, আরেকটি প্রেমের গল্পের পর আমাদের আর দেখাও হয়নি কখনও, কথাও হয় নি। কিন্তু আমি জানি আবার যদি দেখা হত ঠিক যেখানে আমাদের কথা শেষ হয়েছিল, তারপর থেকেই শুরু করতে পারতাম আবার। আমি বিশ্বাস করি আবার দেখা হবে। জন্মান্তরে। কাজেই আমি ভাববই না যে, উনি আর নেই, প্রতিদিন যেমন কাজ করি, আজও ঠিক সেই কাজগুলিই করব।

দীর্ঘদিনের চিকিৎসক বন্ধু দেবাশীষবাবুর আক্ষেপ চলে যাবার আগে কোনো সূত্রই রেখে গেল না। শিল্পীর নিজস্ব বিষণ্ণতা থাকাটাই স্বাভাবিকতার সাথে কি যুক্ত হয়ে গেছল রূঢ় বাস্তবের একাকিত্ব? অন্তসলিলা ফল্গুর মতো বাঙালির হৃদয়কে খান খান করে দিয়েছিল অন্তিমযাত্রার শোক বিহ্বলতায়। এই একাকিত্বের কথা ব্যক্তিগত চিকিৎসক রাজীববাবুও অনুভব করেছিলেন। 'বাবা মা-র উপর মানসিকভাবে খুবই নির্ভরশীল ছিলেন, বাবা মায়ের স্মৃতি থেকে এক মুহূর্তও সরতে পারতেন না। খুবই ইনভলভড্ ছিলেন। সেখান থেকেই একাকিত্ব, বিষণ্ণতা। তাই একান্ত নির্জনতার সঙ্গে, স্ব-নির্বাচিত একাকিত্বের সঙ্গে লড়াই করেও কী করে অমন সব ক্লাসিক তৈরি করতে পারতেন তিনি, তার কেমিস্ট্রি শুধু ঋতুপর্ণই জানেন। তবে সন্দেহ নেই, অসুখ তাঁকে হারিয়েই দিল, হারিয়ে দিল তাঁর চিকিৎসকদের শত শুভেচ্ছাকে। মৃত্যুর অভিব্যক্তি কী; ক্ষতি, শূন্যপুরণ, যা রেখে গেলেন তা অবিনশ্বর এক ইতিহাস।

স্মৃতির পরে স্মৃতি জমে যায়।
শব্দ আসে না মনে,
পরতে পরতে কণ্ঠরুদ্ধ,
ঋতু চলে যায়, বারে বারে ফিরে আসে।।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ সময়োচিত সাহায্য প্রাপ্তির জন্য, যে সমস্ত পত্র, পত্রিকা, প্রবন্ধ ও পুস্তক এই প্রবন্ধ নির্মাণকালে অভাবনীয় সহায়তা করেছে তারই উল্লেখ রাখলাম —

১) The Telegraph
২) আনন্দলোক
৩) দেশ
৪) The Times of India
৫) এই সময় (রবিবারোয়ারী)
৬) আজকাল ক্রোড়পত্র
৭) প্রতিদিন ক্রোড়পত্র (রোববার)
৮) একদিন পত্রিকা
৯) পরমা
১০) এবেলা
১১) ৩৬৫ দিন অতিরিক্ত ক্রোড়পত্র 'বিবি'
১২) ঋতুপর্ণ ও বাংলা সিনেমার মানোন্নয়ন - সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
১৩) চিত্রাঙ্গদার খোঁজে - অর্ণব সাহা - বর্তমান পত্রিকা
১৪) ঋতুহারা - রবিবার - বর্তমান
১৫) ঋতুপর্ণর সঙ্গে দশমাস - শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬) ব্যোমকেশ বক্সী - অনিরুদ্ধ ধর
১৭) ঋতু-মহাভারত - অসম্পূর্ণ অধ্যায় - দেবজ্যোতি মিশ্র
১৮) রাঙাপিসিমার পুনরাবির্ভাব - অনিরুদ্ধ ধর
১৯) ঋতুঅবসান - চপল ভাদুড়ী
২০) ঋতুপর্ণ সম্পাদক ও সহকর্ম্মী - সুদেষ্ণা বসু